সাম্যবাদ

৩ | ৩ | ৪ | ৫

web: www.spbm.org বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র, ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি,২০২২ মূল্য ৫ টাকা

অমিক্রন সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কর

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) বিশেষ সাংগঠনিক সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক মানস নন্দী ও সদস্য সচিব মাসুদ রানা এক যুক্ত বিবৃতিতে অমিক্রণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, "গত নভেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট 'অমিক্রণ' প্রথম সনাক্ত হয়। এরপর দ্রুত সারা বিশ্বে এটি ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটি করোনার অন্য যেকোনো ধরণের চাইতে মারাত্মক সংক্রমণক্ষম। গত কয়েক দিনে সারাবিশ্বে প্রতি দিন গড়ে প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে যা মহামারির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রায় ২২টি রাজ্যে অমিক্রণ ছড়িয়ে পড়েছে। দৈনিক দেড় লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। সেখানে ভারত সরকার আংশিক লকডাউনসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। আমাদের দেশেও করোনা শনাক্তের হার ইতোমধ্যে ৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। অথচ দৈনিক ১৯ হাজার মানুষের পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৮ জন মানুষ অমিক্রণ ধরণ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে যা উদ্বেগজনক।"

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, "গত মাসে মারাত্মক সংক্রমণক্ষম অমিক্রণ ছড়িয়ে পড়লেও তা প্রতিরোধে সরকার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেনি। ২৮ নভেম্বর সরকার এ সংক্রান্ত ১৫ দফা নির্দেশনা জারি করলেও তা বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে আবারও করোনা সংক্রমণের নতুন ঢেউয়ের আশঙ্কা তৈরী হচ্ছে।" বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, "সরকার প্রবল জনবিক্ষোভের আশঙ্কায় ভীত হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনসমাবেশ বন্ধ সহ লক-ডাউনের মাধ্যমে সংক্রমণ রোধে পরিকল্পনা করছে যা শুধু ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হবে না, বরং জনজীবনকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্থ করবে। সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে।"

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের চলমান আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও পুলিশের হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জোটের তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ সমাবেশ

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সংলাপ-এর নাটক নয়

জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় চাই নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকার

নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতি সংলাপ করছেন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে। সংলাপ ও সার্চ কমিটির মাধ্যমে 'সকলের মতামতের ভিত্তিতে' নির্বাচন কমিশন গঠনের এই নাটক দেশের মানুষ গত দুই মেয়াদে দেখেছে। এই প্রক্রিয়ায় নিয়োগকৃত দু'টি নির্বাচন কমিশন ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার 'নির্বাচন' এবং ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর রাতের আঁধারে ভোটডাকাতির 'নির্বাচন' করেছে। এদেশের জনসাধারণ বোঝে – নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকারের গণদাবিকে পাশ কাটিয়ে আরেকটি প্রহসনের নির্বাচন করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার আওয়ামী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই রাষ্ট্রপতি 'স্বাধীন' নির্বাচন কমিশন নিয়োগে সংলাপ করছেন। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বলে – এর মাধ্যমে কৌশলে তাদের পছন্দসই বশংবদ লোকদেরই নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে।

আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৩ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে এক চরম অগণতান্ত্রিক, গণবিরোধী, দুর্নীতিগ্রস্ত ও নিপীড়নমূলক শাসন চালাচ্ছে। তাদের শাসনে লাভবান হচ্ছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি-লুটেরা ব্যবসায়ী-ধনিকশ্রেণী, সামরিক-বেসামরিক আমলা, দলীয় সুবিধাভোগী, টাউট-বাটপার, মধ্যসত্বভোগী ও ভারত-চীনসহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সংকটজর্জরিত সাধারণ মানুষ এই দুঃশাসন থেকে মুক্তি চায়। বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির সঠিক পথ ও নেতৃত্ব জানা নেই, কিন্তু

● ২ এর পাতায় দেখুন

র‍্যাবের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করছে

র‍্যাবের উপর এবং এর বর্তমান ও সাবেক ৭ শীর্ষ কমকর্তার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে নানারকম প্রতিক্রিয়া ও বক্তব্য আসছে। সাধারণভাবে র‍্যাব ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন বিভ্রান্তি নেই। এদের কেউই জনগণের বন্ধু নয়, এ ব্যাপারে সবাই পরিস্কার। কিন্তু যেহেতু র‍্যাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে প্রশাসন নিজেই দুনিয়ার দেশে দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করছে এবং প্রতি মূহুর্তে মানবাধিকারকে দু'পায়ে মাড়াচ্ছে–ফলে এ নিয়ে আওয়ামী শিবিরের বাইরেও বেশকিছু বিরোধী বক্তব্য চোখে পড়ছে। তাদের বলতে শোনা যাচ্ছে যে, 'মার্কিন সরকার নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরির জন্য এইরকম অভিযোগ বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে আনে। তাদের নিজেদের দেশে তারা মানবাধিকারের চিহ্নমাত্র রাখেনি। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এইরকম সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার প্রশ্নই আসে না। সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের যত সমালোচনাই থাকুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর এ ধরনের চক্রান্তকে উন্মোচিত করাই উচিত।' তারা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে একপেশেভাবে বিরোধীতা করতে গিয়ে দেশের অভ্যন্তরে ফ্যাসিবাদের পক্ষেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তকে সমর্থন বা অসমর্থন করার প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটি হচ্ছে, যে অভিযোগটি র‍্যাবের বিরুদ্ধে এসেছে সেটা সত্য নাকি মিথ্যা? এটাকে কে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে সেটা দ্বিতীয় প্রশ্ন। সংগত কারণেই এখানে দুটো অংশই আলোচনা করতে হবে।

প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)' এর ওপর এবং এর বর্তমান ও সাবেক ৭ শীর্ষ কর্মকর্তার ওপর মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নকে ভিত্তি করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে গত ১০ ডিসেম্বর। এই ১০ ডিসেম্বরের পর প্রায় দেড় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ে র‍্যাবের সাথে কারও কোনও বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটেনি। অথচ মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আসার কয়েক ঘণ্টা আগেও বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় র‍্যাব ও ডাকাত দলের মধ্যে 'বন্দুকযুদ্ধে' এক সন্দেহভাজন 'ডাকাত' নিহত হন। এর মাত্র ৪ দিন আগে ভোলায় এলিট ফোর্সের সঙ্গে এমনই আরেকটি 'বন্দুকযুদ্ধে' আরও ২ সন্দেহভাজন 'ডাকাত' নিহত হন। কুমিল্লার ওয়ার্ড কাউন্সিলর হত্যা মামলার ৩ আসামি গত বছরের ৩০ নভেম্বর

● ২ এর পাতায় দেখুন

প্রকাশিতব্য...

বাসদ (মার্কসবাদী)'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, অনন্যসাধারণ কমিউনিস্ট বিপ্লবী কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী স্মরণে শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে 'কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী স্মারকগ্রন্থ'।

আপনার কপি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন:
২২/১ তোপখানা রোড(৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭১১৮৮৯০৮০

জনগণের ভোটাধিকার

সরকারবিরোধী ক্ষোভ ও পরিবর্তনের আকাঙ্খা জনগণের মধ্যে তীব্র। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও উন্নয়ন'-এর বুলি আউড়ালেও জনসমর্থন তাদের পক্ষে নেই এটা বুঝতে পেরেই আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। বিরোধী শক্তি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতার কারণে ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচনের পর ক্ষমতায় ৫ বছর টিকে থাকতে পেরে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়েছে।

২০১৮ সালে দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সব দলকে অংশগ্রহণ করানোর পরে প্রশাসন, পুলিশ-র‍্যাব ও নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে আগের রাতেই ব্যালট বাক্স ভর্তি করেছে। সামনে ২০২৩ সালে একই ধরণের প্রহসনমূলক নির্বাচন ভিন্ন কৌশলে করে তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চায়।

এই নীলনকশার অংশ হচ্ছে রাষ্ট্রপতির সংলাপের নামে 'রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে' নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের নাটক। যেকোন গণতান্ত্রিক শক্তির উচিত – অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অর্থহীন সংলাপ বয়কট করে অনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের অবিলম্বে পদত্যাগের মাধ্যমে সকলের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠনের দাবিকে জোরালো করা।

নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং আওয়ামী লীগ আমলে ওই ব্যবস্থা বাতিলের পর দলীয় সরকারের অধীনে বিগত দু'টি নির্বাচনের তুলনামূলক অভিজ্ঞতা দেশবাসীর হয়েছে। এর আগে দলীয় ও সামরিক সরকারের অধীনে ১৯৭৩, ৭৯, ৮৬, ৮৮, ৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচন ও বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনসহ হ্যাঁ-না গণভোটের তিক্ত অভিজ্ঞতা এদেশের মানুষের আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ৪টি ছাড়া আর কোন নির্বাচনেই জনগণ স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে পারেনি। এর কারণ – স্বাধীনতার পর থেকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ইত্যাদি বুর্জোয়া দলগুলো কেউই সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধারণ করে না। বিচার বিভাগ-প্রশাসন-নিরাপত্তা বাহিনীসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তারা দলীয়করণ করেছে, সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে তারা নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দলীয় সন্ত্রাস চালিয়ে বিরুদ্ধ মত দমন করেছে। এমনকি শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের ন্যূনতম অধিকারটুকু কেড়ে নিতে চেয়েছে ভোটডাকাতি-জালিয়াতির মাধ্যমে। এর ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার নির্বাচনী ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে।

বাংলাদেশে এই বুর্জোয়া দলগুলোর নেতৃত্বাধীন দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়ার কোন বাস্তবতা আপাতত নেই। নির্বাচন কমিশনের হাতে যত ক্ষমতাই থাকুক, ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছা ও সহযোগিতার বাইরে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জবরদস্তি ও কূটকৌশলের মাধ্যমে যেকোন মূল্যে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে মরিয়া। ফলে, গণআন্দোলন-গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই অবৈধ সরকারের পতন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ের কোন বিকল্প নেই। গণতন্ত্র রক্ষায় কাঙ্খিত সেই গণআন্দোলন গড়ে উঠতে হলে চাই – সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে ভুক্তভোগী জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে তাদের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে সংগঠিত করা। এবং এর সাথে ভোটাধিকারসহ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে যুক্ত করা।

মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে এও জানে – ভোট হলেই গণতন্ত্র হয় না, জনগণের জীবন-জীবিকার সংকট সমাধান হয় না। এর সাথে দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তন, জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক-জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা ও জনস্বার্থ রক্ষায় সংগ্রামী-নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি যুক্ত। আবার ভোটের অধিকারটুকু না থাকলে দেশ শাসনে জনগণের মতামত নেয়ার ও জবাবদিহিতার ন্যূনতম গুরুত্বটুকুও থাকে না।

তখন শাসকগোষ্ঠী অধিকতর স্বৈরতান্ত্রিক-ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠে, গণআন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো কেড়ে নেয়া হয় বা সংকুচিত হয়। সভা-সমাবেশের অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠিত হওয়ার অধিকার, আইনের শাসন ইত্যাদি সংকুচিত হলে গণআন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ভোটাধিকার রক্ষায় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন

ও ২ ডিসেম্বর ভোরে পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন। ১০ ডিসেম্বরের পূর্বের এই ঘটনা এবং তার ঠিক পরের ঘটনা থেকে এটা অনুমান করা সহজ যে, 'বন্দুকযুদ্ধ' ব্যাপারটা র‍্যাব বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং তা নিরাপত্তার স্বার্থে অনিচ্ছাকৃত কিন্তু অত্যাবশকীয়ভাবে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়।

এই 'বন্দুকযুদ্ধ' ঘটনাটা কী–সেটা নিশ্চয় পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না। ২০০৪ সালে র‍্যাব সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই বন্দুকযুদ্ধের শত শত ঘটনা আপনারা পত্রিকার পাতায় দেখেছেন। অপরাধীকে (আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখে অপরাধী, আদালতে প্রমাণিত নয়) গ্রেফতার করে আদালতে হাজির না করে পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় হত্যা করাকে বলে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বছরের পর বছর ধরে ঘটছে।

একে যুক্তিযুক্ত করতে যে ব্যাখ্যা সবচেয়ে বেশি দেয়া হয় সেটা হলো 'বন্দুকযুদ্ধ'। এই বন্দুকযুদ্ধেও যতগুলো গল্প এখনও পর্যন্ত আমরা শুনেছি সেগুলো মূলত: দুটি ধরনের। প্রতিটি ঘটনা সাধারণত দুটি মডেলের যে কোন একটিতে পড়ে। মডেল এক, অপরাধীকে ধরতে ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর অপরাধীরা ধরা না দিয়ে গুলি ছোঁড়ে, তখন র‍্যাব আত্মরক্ষায় পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। অপরাধী ঘটনাস্থলে মারা যায়। মডেল দুই, ধরা পড়া অপরাধীকে নিয়ে র‍্যাব তার আস্তানায় যায়, কিংবা অন্য অপরাধীদের ধরতে যায়। সেখানে যাওয়ার পর বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয় এবং যে অপরাধীকে নিয়ে র‍্যাব অন্য অপরাধীদের ধরতে গেছে সেই-ই বন্দুকযুদ্ধের মধ্যে পড়ে মারা যায়, যার পোশাকী নাম 'ক্রসফায়ার'।

র‍্যাব সৃষ্টির আগেও বন্ধুকযুদ্ধ ছিল, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ছিলো। ২০০২ সালে সেনাবাহিনীকে রাজপথে নামিয়ে দিয়ে শুরু করা হয়েছিল 'অপারেশন ক্লিন হার্ট'। সেই গল্প একটু ভিন্ন ছিল। এখানে ধরা পড়া অপরাধীরা 'হার্ট অ্যাটাক' হয়ে মারা যেতেন। সেই সময়ের মতো বছরে এতো হার্ট অ্যাটাক জাতি আর কখনও দেখেনি।

র‍্যাব সৃষ্টির পর বন্দুকযুদ্ধ আরেক মাত্রা পায়। মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার' এর মতে, ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' অন্তত ৩ হাজার ১৩৫ জন নিহত হয়েছেন।

২০০৮ সালের আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করলেন, তারা ক্ষমতায় গেলে 'বিচারবহির্ভূত হত্যা' বন্ধ করা হবে। অথচ তারা ক্ষমতায় আসার পরই এটি রেকর্ড ছাড়িয়ে গেলো। ২০০৯ সালে শুধু মার্চ মাস ছাড়া ওই বছর জুড়েই 'বন্দুকযুদ্ধ' হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৬০০ জনেরও বেশি লোকের নিখোঁজের পেছনে র‍্যাব ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দায়ী বলে এনজিও গুলোর অভিযোগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার রিপোর্টে বিশেষ করে মাদকবিরোধী অভিযানের কথা উল্লেখ করেছে। ২০১৮ সালে দেশে মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করার পর এই বন্দুকযুদ্ধ আরও একধাপ অগ্রগতি লাভ করে। ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত তাদের হাতে প্রায় ৬০০টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

এরইসাথে যুক্ত হয়ে আছে 'গুম'। র‍্যাব ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বাড়ি যাকে যখন ইচ্ছা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর আর তার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। র‍্যাব কিংবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গ্রেফতার করেছে বলে স্বীকারও করছে না। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৪০৯ জন মানুষ গুম হয়েছেন।

আরও অনেক লম্বা ফিরিস্তি দেয়া যাবে দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বিশেষত র‍্যাবকে নিয়ে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে পাকাপোক্ত করতে জবরদস্তির মাধ্যমে মানুষের মুখ বন্ধ করে দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিলো তাদের। তুলে নিয়ে হত্যা করার সময়ে দেখে ফেলার জন্য আর চারজনকে খুন করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার ঘটনাও র‍্যাব ঘটিয়েছে। ফলে র‍্যাব ও তার বর্তমান ও সাবেক কিছু শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আসা অভিযোগগুলো বিন্দুমাত্র মিথ্যে নয়।

দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দলের সিনেটরদের একটা দল ট্রাম্প সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি লিখে র‍্যাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছিল। এ বছরের আগস্টে র‍্যাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগের শুনানি হয়েছে। এসবকিছু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরে চাপ হিসেবে কাজ করেছে বলে অনেকেই মনে করেন। যদিও একথা সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের পুলিশি দক্ষতা অর্জনে র‍্যাবকে সহযোগিতা দিয়ে এসেছে। US International Criminal Investigation Training Assistance Programme এর অধীনে ২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত র‍্যাব সদস্যদের ৫টি ব্যাচ ট্রেনিং নিয়ে বেরিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে র‍্যাব বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতিও কিনেছে বিভিন্ন সময়ে।

বাস্তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের দেশেই চরম পুলিশি নির্যাতন চালাচ্ছে এবং প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সেখানে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটছে।

২০২০ সালের ৪ জুন মিউইয়র্ক পুলিশের এক সদস্য হাঁটুর নিচে চাপ দিয়ে ধরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে হত্যা করেন জর্জ ফ্লয়েড নামের এক কৃষ্ণাঙ্গকে। এভাবে হত্যা নতুন নয়, বিশেষতঃ যখন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে লোকটি আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছে তখন তার মুখ থেকে বের হওয়া করুণ আর্তি, 'I can't breathe' যা সেসময় এক বিরাট আন্দোলনের স্লোগানে পরিণত হয়েছিলো সেটাও নতুন নয়। 'Ican't breathe' প্রথম উচ্চারণ করেন ২০১৪ সালে এরিক গার্নার নামে আরেক কৃষ্ণাঙ্গ যিনি একই প্রক্রিয়ায় নিউইয়র্ক পুলিশের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়া যুক্তরাষ্ট্রে চলছে দিনের পর দিন ধরে। সেই যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে কাউকে শাস্তি দিলে তার পেছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে।

এখানে আরেকটা বিষয়ও এসেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ায় এতদিন পর্যন্ত ভারতকেন্দ্রিক নীতিতে ছিলো। এখন সে এই অবস্থায় থাকতে চায় না। এখানে চীনের যে প্রভাব সেটাকে মোকাবেলা করার জন্য ভারতকে সে যথেষ্ট মনে করছে না। ফলে সে নিজেই এটা মোকাবেলা করতে চায়, ভারতের মাধ্যমে নয়। সরকারকে চাপে ফেলার নীতি থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন সিদ্ধান্তের পেছনেই কোন সৎ উদ্দেশ্যে নেই। আবার চাপে ফেলার নীতি কিংবা অন্য কোন কৌশল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সিদ্ধান্ত নিলেও তার কারণে র‍্যাবের ভূমিকাকে সমর্থন করার কোন প্রশ্ন উঠে না। ফলে আওয়ামী লীগ সরকার তার জবরদস্তিমূলক শাসনের হাতিয়ার হিসেবে র‍্যাবকে ব্যবহার করে বিদেশি শক্তি তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে এদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিচ্ছে। আবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে এমন কিছু করা যাবে না যা ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের পক্ষে যায়। কারণ মনে রাখতে হবে, আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনই বর্তমানে দেশের মানুষের মূল শত্রু।

৩০ ডিসেম্বর 'কালো

সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাম জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বজলুর রশীদ ফিরোজ, বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাসদ(মার্কসবাদী)র কেন্দ্রীয় নেতা মানস নন্দী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুস সাত্তার, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের হামিদুল হক ও গণসংহতি আন্দোলনের বাচ্চু ভূঁইয়া প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "সীমাহীন 'ভোট ডাকাতি', কেন্দ্র দখল ও জাল ভোটের মাধ্যমে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিল।

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত একতরফা নির্বাচনের ভোটাধিকার হরণের দুঃসহ স্মৃতি ভুলতে না ভুলতেই, পুলিশসহ পুরো প্রশাসনযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে ৩০ ডিসেম্বরের ভোট ২৯ ডিসেম্বর রাতের আঁধারে যে ঘৃণ্য কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল, তা গোটা জাতিকে হতবাক করেছিল। নৌকা প্রতীকে ভোট না দেওয়ার কারণে দলীয় সন্ত্রাসীদের দ্বারা নোয়াখালীতে একজন গৃহবধূ গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল। অনুগত বিরোধীদলের কয়েকজনকে সাংসদ 'নির্বাচিত' করেছিল। ফলে সংসদ কার্যত হয়ে উঠেছিল ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের ইচ্ছা পূরণের যন্ত্র। এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকারের অনুষ্ঠিত সমস্ত নির্বাচনে ব্যাপক 'হত্যা, হুমকি, হামলা-মামলা ও কেন্দ্র দখলের ভোট' হিসাবে জনমনে প্রতিভাত হয়েছে। অথচ আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন নির্লজ্জভাবে একে উৎসব হিসাবে চিত্রিত করেছে।"

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, "আমাদের দলসহ বাম প্রগতিশীল সমস্ত রাজনৈতিক দল, শক্তি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীন, সাংবিধানিক ক্ষমতাসম্পন্ন নির্বাচন কমিশন দাবি করে আসছে। দল নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকার অধ্যাদেশ জারি করে এ কমিশন গঠন করবে। নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাহী ক্ষমতা কমিশনকে প্রদান করতে হবে। পরবর্তী সরকার যেকোনো সময় নির্বাচিত এমপিদের প্রত্যাহার (ৎব-পধষষ) করতে পারা এবং সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের জন্য সংবিধানে পরিবর্তন আনতে হবে। এসব বিষয় আলোচ্যসূচিতে না রেখে বর্তমান সময়ে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতির সংলাপ অনুষ্ঠান সকল রাজনৈতিক দলের বর্জনের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে অতীতের মতো তামাশায় পর্যবসিত হয়েছে।"

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে অবৈধ সরকারকে পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে জোটবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে বামপন্থী, গণতন্ত্রমনা সকল শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

‘জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২০’

পিছিয়ে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের শিক্ষার মান ২.৮ শতাংশ মাত্র। এ অবস্থায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও অবকাঠামোগত কারণেই ধারাবাহিক মূল্যায়ন অসম্ভব।

পরীক্ষার বাইরে ‘ধারাবাহিক মূল্যায়ন’, ‘অংশীজন মূল্যায়ন’, ‘সতীর্থ মূল্যায়ন’ ‘ট্যাকনোলজি ব্যবহার’ ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে শুরু থেকেই দুর্নীতি যুক্ত হবে। অংশীজন কারা হবেন? বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে, স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, আমলা, মন্ত্রীরাই অংশীজন হবেন। তারা তাদের প্রভাব খাটিয়ে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রভাবিত করবেন। শিক্ষকদের একটা অংশও নানা কারণে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন। এতে স্বজন পোষণের সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে একদিকে যেমন বৈষম্য প্রকট হবে, অন্যদিকে তৈরি হবে মেধাশূণ্যতা। আবার নতুন কারিকুলামের ফলে প্রশিক্ষণের নামে দেশে-বিদেশে যাতায়াত ইত্যাদির নামে চলবে অবাধ লোপাট। নতুন কারিকুলামের উপযোগি বই,পুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থাকে ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। শিক্ষকরা যেহেতু পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন, ফলে তারা শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গাইডের সহায়তা নেবেন। শিক্ষার্থীরা নির্ভরশীল হয়ে পড়বে গাইড বই ও কোচিং প্রতিষ্ঠানের উপর। এ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী, ৯ম-১০ম শ্রেণিতে এখন আর আলাদা করে মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসা শিক্ষা বিভাগ থাকবে না। এতে বিশেষত, বিজ্ঞান শিক্ষা সংকুচিত হবে। বর্তমানে ছাত্ররা পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান আলাদা তিনটি বিষয়ে ৩’শ নাম্বার পড়ে, শিক্ষাক্রম অনুসারে একটি বইয়ে পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ১’শ নম্বর পড়বে। এর মানে হলো বিজ্ঞান শিক্ষার মান নামিয়ে দেয়া হলো। এমনিতে বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা সংকোচিত হচ্ছে, তার উপর এই পদক্ষেপ বিজ্ঞান শিক্ষাকে পঙ্গু করে দিবে। এখন শিক্ষার্থীদের উচ্চতর গণিত পড়তে হয়, কিন্তু নতুন শিক্ষাক্রমে তাও বাদ দেয়া হয়েছে। এর ফলে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ে ছাত্ররা থেকে যাবে অজ্ঞ। ফলে উচ্চতর শিক্ষায় যখন যাবে; তখন বিজ্ঞান হয়ে উঠবে তার কাছে দুর্বোধ্য। বিজ্ঞানী,গবেষকের বদলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করবে একদল ট্যাকনোক্রেট। এদিকে ‘জীবন-জীবিকা’, ‘তথ্য প্রযুক্তি’ ও ‘ভালো থাকা’ বিষয় পড়ানোর মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষাকে প্রধান্য দেয়া হবে। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে একদল গধহঁধষ ডড়ৎশবৎ সৃষ্টি করা। আমাদের দেশে দ্বাদশ শ্রেণিতে পৌছাবার পূর্বেই ঝরে পড়ে প্রায় ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী। সরকার এদের প্রি- ভোকেশনাল শিক্ষা দিয়ে শ্রমবাজারে ঢুকিয়ে দিতে চায়। আমাদের দেশে কারিগরি বোর্ড,পলিটেকনিক ইনস্টিউট ইত্যাদি থাকার পরও কেন শিক্ষার প্রধান ধারাকে কারিগরি নির্ভর করতে চাচ্ছে?

অনেকেই মনে করছেন জাতীয় শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বোধ One channel of education Pvjy Kiv n‡”Q! Avm‡j Zv bq| One channel of education- মানে শিক্ষার অভিন্ন ধারা, অভিন্ন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির সাথে বৈষম্যহীন শিক্ষার প্রসার। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত ৪ ধারায় বিভক্ত। এগুলিই আবার বিভিন্ন উপধারাও আছে। আর বিভিন্ন ধারার শিক্ষা মানেই বৈষম্য। নতুন পাঠক্রমে শিক্ষায় বিভিন্ন ধারা ও বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে কোন কথা নেই। বাংলা মাধ্যমের জন্য একটি অভিন্ন পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করেই সরকার প্রচার করতে চায় যেন One channel of education চালু করেছে। কিন্তু এই পাঠক্রমটি বাস্তবে শিক্ষার প্রধান ধারাকে কারিগরি পর্যায়ে নামিয়ে আনছে। যা খণ্ডিত শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এদিকে এসএসসি, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে নেয়া হবে পরপর ৩টি পাবলিক পরীক্ষা। যা ছাত্রদের জন্য হবে চাপের। অল্প সময়ে অধিক সিলেবাস ও পরীক্ষার চাপ বাড়িয়ে ছাত্রদের extra curricula activity সংকোচিত হবে। দশম থেকে দ্বাদশে পরপর তিনটি পাবলিক পরীক্ষা চালুর যুক্তি সরকার ছাড়া আর কারো কাছে বোধগম্য নয়! শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা শুরু হবে প্রি প্রাথমিক থেকে। সরকারি অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই প্রাক-প্রাথমিকের আয়োজন। আবার প্রাথমিকের ৪৯.৩৫ শতাংশ স্কুলই বেসরকারি। অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবেই শিশুদের একটি বড় অংশ ভর্তি হবে কিন্ডারগার্টেন বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। প্রি-প্রাথমিক থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন বই ও পরীক্ষা থাকবে না। শিক্ষকরা তাদের শিক্ষা নির্দেশিকা থেকে ছাত্রদের পড়াবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বাংলাদেশের শিক্ষকদের মান অত্যন্ত দুর্বল। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এই বয়সেই শিশুদের সামাজিকীকরণ ও চিন্তার বিকাশ ঘটে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সকল দায়িত্ব শিক্ষকদের হাতে তুলে দিলে ও কোন ধরনের বই না থাকলে এক ভয়ংকর বিপদের দিকে ধাবিত হবে সম্পূর্ণ প্রজন্ম।

‘জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২০’ এ পিইসি-জেএসসি পরীক্ষা নিয়ে কোন স্পষ্ট ঘোষণা নেই। যদি পিইসি-জেএসসি পরীক্ষা বাতিল না হয় তবে ১২ ক্লাসের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের ৫টি প্রতিযোগিতামূলক পাবলিক পরীক্ষা দিতে হবে। যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

সরকার কি চায়? শিক্ষাক্রমে বলা হচ্ছে “...সামগ্রিক আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বল্পোণত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই অভিলক্ষ্য পূরণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার শিক্ষা। আর সে জন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নাই। আর এই আধুনিকায়নের শুরুটা হতে হবে অবশ্যই একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে যা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে”। সরকারের ‘যুগোপযোগী কার্যকর’ শিক্ষার মানে কি? এর মানে হলো বিশেষ ভাবে দক্ষ একদল মানুষ তৈরি করা, যারা শাসক শ্রেণির অর্থনীতি ও এজেণ্ডাকে বাস্তবায়ন করবে। কেন? কারণ তাদের সামনে আছে ‘ডেল্টা প্ল্যান’। অর্থাৎ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে সামনে বিশ্বব্যাপী যে ধরণের কাজ ও শ্রমিকের প্রয়োজন হবে তেমন ধরণের মানুষ তৈরি করা। শিক্ষাক্রমে বলা হচ্ছে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ নজিরবিহীন পরিবর্তন ঘটিয়ে চলছে মানুষের কর্মসংস্থান এবং জীবন যাপনের প্রণালীতে, যেমন যন্ত্র ও মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক আরো নিবিড় হচ্ছে।...এর ফলে বর্তমান সময়ের কর্মজগতের অনেক কিছুই ভবিষ্যতে যেমন থাকবে না, ভবিষ্যতে তেমননি অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে” এ জন্য বাংরাদেশ সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছে। যার ফলাফল জাতীয় শিক্ষাক্রম -২০২০। সরকার চায় ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনে সক্ষম একদল শ্রমিক তৈরি করা। আওয়ামী সরকার এর পূর্বেও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করে বলেছিল, চিন্তার ক্ষমতা বাড়বে, মুখস্থ নির্ভরতা কমবে, কিন্তু হয়েছে তার উল্টো। এভাবে বিভিন্ন সময় শাসকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছে,পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। আর এ সব কর্মকাণ্ডের বলি হয়েছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরাও। ভালো ভালো কথার মোড়কে ‘জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২০’ ও একই পথে যাত্রা শুরু করবে। যা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনবে।

‘উন্নয়নে’র বলি সাধারণ

শেষ উন্মুক্ত বিনোদনকেন্দ্র পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত (সি বিচ) ইজারা দেওয়া হচ্ছে। নগরজীবনের ক্লান্তি কাটাতে সাধারণ মানুষ সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারি ছুটির দিনে বা যেকোন উৎসবের দিন ছুটে আসে পতেঙ্গা সি বিচে। অথচ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা সিডিএ সাধারণ মানুষের এ স্বস্তির জায়গাটুকু কেড়ে নিতে চায়। পতেঙ্গা সি বিচকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার কথা বলে সিডিএ পতেঙ্গা সি বিচের ৭ কিলোমিটার ও ইপিজেড সাগরপাড়ের ৩৫ একর জায়গা দেশি-বিদেশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হাতে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্থানীয় পত্রিকার খবরে প্রকাশ - “পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত থেকে ইপিজেডের দিকে আসতে প্রথম ৭০০ মিটার রাখা হয়েছে এক্সক্লুসিভ জোন -‘এ’। পরবর্তী পাঁচ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার থাকবে উন্মুক্ত। পাঁচ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার প্রান্ত যেখানে শেষ হবে (খেজুরতলা) সেখান থেকে মাইট্টা খাল পর্যন্ত ৮০০ মিটার অংশকে এক্সক্লুসিভ জোন-‘বি’ রাখা হয়েছে। তাহলে দুই এক্সক্লুসিভ জোন মিলে ১৫০০মিটার (দেড় কিলোমিটার) এলাকায় থাকছে প্রবেশমূল্য।... এক্সক্লুসিভ জোনে প্রবেশমূল্য রাখা হয়েছে জানিয়ে সিডিএ’র প্রধান প্রকৌশলী কাজী হাসান বিন শামস বলেন, এক্সক্লুসিভ জোনসহ পুরো সাত কিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় বিচ রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ বিল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান জোন-এ ও জোন-বি অংশে বিভিন্ন ধরণের রাইড, ক্যাবলকার, টয়ট্রেনসহ পর্যটন বান্ধব বিভিন্ন রাইড সংযুক্ত করবে। এই এক্সক্লুসিভ জোনে প্রবেশের জন্য একটি প্রবেশমূল্য নির্ধারণ করা থাকবে।

যে বিনিয়োগকারী এখানে বিনিয়োগ করবে তার বিনিয়োগের অর্থ উঠিয়ে আনতে হবে। একই সাথে সাত কিলোমিটার এলাকার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ খরচ হবে। এসব অর্থ উঠে আসবে প্রবেশমূল্য থেকে।” (১০ডিসেম্বর, ২০২১, সুপ্রভাত বাংলাদেশ) এর মধ্যেই সিডিএ’র প্রস্তাব গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে এবং বেসরকারি ইজারাদার নিয়োগের জন্য টেণ্ডার ডাকার অনুমতি দিয়েছে। আমাদের দেশে বেসরকারিকরণের ফেরিওয়ালারা যে যুক্তি দেয়, সিডিএ সেটাই দিচ্ছে। অর্থাৎ টাকা নেই। সি বিচের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সড়কবাতি, নিরাপত্তাসহ পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের জন্য টাকা নেই। তাহলে প্রশ্ন আসে, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তারা নগরীতে একের পর এক প্রকল্প কিভাবে বাস্তবায়ন করছে? এ অপকর্ম করতে সিডিএ নিজেদের প্রণীত চট্টগ্রাম শহরের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা বা মাস্টারপ্ল্যানকেও লংঘন করছে। এতে পতেঙ্গা সি বিচকে ‘পাবলিক ওপেন স্পেস’ অর্থাৎ ‘জনগণের জন্য উন্মুক্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাস্তবে এর পেছনে আছে নগর উন্নয়নের নামে ইজারা ও কমিশন বাণিজ্য করে শত শত কোটি টাকা লুটপাটের মুনাফালোভী সিণ্ডিকেট। তাদের কাছে লুটপাট ও মুনাফাই প্রধান। আবাসিক প্লট বিক্রির নামে সিডিএ’র দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের কমিশন বাণিজ্যের কথা কারো অজানা নেই। পতেঙ্গা সি বিচ একটি পাবলিক বিচ। হাজার বছর ধরে প্রাকৃতিক ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। এর উপর সবার সমান ও অবাধ অধিকার প্রাকৃতিক, এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। এসব প্রাকৃতিক উন্মুক্ত স্থানে প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপ বা টিকেট ধার্য করার চিন্তা দেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন এবং তুরাগ নদী দখল ও দূষণ নিয়ে করা রিটের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের প্রদত্ত ঐতিহাসিক রায়ের গুরুতর লংঘন। উক্ত রায়ে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক, ২১, ৩১, ৩২ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীরপাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস ইত্যাদি সবকিছুকে পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তি বা জনগণের সম্পত্তি উল্লেখ করে এগুলোর কোন একটির অধিকার থেকে নাগরিকদেরকে বঞ্চিত করা সংবিধান পরিপন্থী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রায়টিতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে পাবলিক ট্রাস্ট ডকট্রিন বা মতবাদ নিয়ে। এ মতবাদের মূল কথা হলো, জনসাধারণের উপকারার্থে রাষ্ট্রের কাছে গচ্ছিত সম্পত্তিকে পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তি বলা হয়। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, সব উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর তীর, টিলা, বন এবং বাতাস – এসব পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। এসব সম্পত্তি সব নাগরিকের, কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়। পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তিতে সাধারণ জনগণের মুক্ত এবং বাধাহীন ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হচ্ছে এখানে ট্রাস্টি। রোমান, ইংলিশসহ পৃথিবীর বহুদেশের আইন ব্যবস্থায় এই মতবাদ গৃহীত। স্বীকৃত হয়েছে অনেক দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় দ্বারা। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, সব উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তিসমূহ বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব নাগরিকের জন্য সংরক্ষিত। এসব সম্পত্তির ওপর জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত। আর এসব মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সংবিধানের ৩১ ও ৩২ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থি। কোনো নাগরিককে এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলে অনুচ্ছেদ ৩১ অনুযায়ী তিনি আইনের আশ্রয়লাভের অধিকারী। এসব মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদ অর্থাৎ রিট মামলা করার পথ সর্বদা খোলা।

এবং এও বলা হয়েছে পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তিগুলো হলো – এর মালিকানা সকলের, না হলে কারও নয়। এগুলো কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানিকে বাণিজ্যিকভাবে ইজারা দেওয়া চলবে না। এ রায়ের উপর ভিত্তি করে হাতিরঝিলকে পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তি ঘোষণা করে এতে কোনো বাণিজ্যিক স্থাপনা করা যাবে না মর্মে হাইকোর্ট আরেকটি মামলায় রায় দিয়েছে। অন্য একটি মামলায় হাইকোর্ট সোনারগাঁয়ে জলাভূমি ভরাট ও কৃষিজমি উচ্ছেদ করে ইপিজেড স্থাপন অবৈধ ঘোষণা করেছে। সিডিএ হাইকোর্টের এ রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর ঔদ্ধত্য কীভাবে পায়?

ইজারাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তাদের লাভের জন্য পতেঙ্গা সি বিচের প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো পরিবর্তন, বিকৃতি বা ক্ষতিসাধন করবে না, তার নিশ্চয়তা কি? ফয়’সলেকের উদাহরণ তো সামনেই আছে। পতেঙ্গার মতো একই যুক্তিতে রেলকর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের ফয়’সলেকের পাহাড়ী এলাকা লাভের আশায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কনকর্ডকে ইজারা দিয়েছিল। তার ফলাফল হলো, চড়ামূল্যের টিকেট, চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে পাহাড়-টিলা গাছপালা কেটে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি, লেকের পানি দূষণ, রেলের লোকসান ইত্যাদি। পতেঙ্গা সি বিচেরও যে একই পরিণতি হতে যাচ্ছে, তা আজ সাদাচোখেই বলা যায়। এছাড়া উন্মুক্ত পতেঙ্গা সি বিচকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষ ,ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হকার জীবিকা নির্বাহ করে। বেসরকারি অপারেটরকে ইজারা দিলে সে মানুষগুলো উচ্ছেদ হবে, জীবিকা হারিয়ে পথে বসবে।

আমরা স্পষ্ট বলতে চাই, আমরা নগরের উন্নয়ন চাই। পতেঙ্গা বিচে জনগণের বিনোদন ও উন্নত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের উদ্যোগ নেওয়া হোক। তবে অবশ্যই তা হতে হবে হাজার বছরে গড়ে উঠা প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ অক্ষুণ্ন ও জনগণের জন্য উন্মুক্ত রেখে রাষ্ট্রীয় আয়োজনে। কারণ নাগরিকদের সুস্থভাবে বাঁচা ও বিনোদনের পর্যাপ্ত আয়োজনের দায়িত্ব রাষ্ট্র এবং নগর কর্তৃপক্ষের। তথাকথিত উন্নয়নের নামে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর স্বার্থে ইতোমধ্যেই একে একে চট্টগ্রামের পাহাড়, খেলার মাঠ, পার্ক, নদী-খাল-পুকুরসহ উন্মুক্ত স্থান ধ্বংস করে চট্টগ্রামকে এক জঞ্জালের শহরে পরিণত করা হয়েছে। চট্টগ্রামের ফুসফুখ্যাত সিআরবিকেও ইউনাইটেড হাসপাতাল করার নামে ধ্বংসের আয়োজন চলছে। একমাত্র অবশিষ্ট আছে পতেঙ্গা সি বিচ। এর উপর জনগণের অধিকার খর্ব করে আজ তুলে দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর হাতে। বাস্তবে সিডিএ’র এ তুঘলকি সিদ্ধান্ত আওয়ামীলীগ সরকারের তথাকথিত উন্নয়ন সম্পর্কিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। উন্নয়নের নামে একের পর এক কৃষিজমি, বনাঞ্চল, পাহাড় উচ্ছেদ করে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিগোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। চট্টগ্রামের বাঁশখালী, মহেশখালীতে গড়ে তোলা হচ্ছে পরিবেশের জন্য ভয়াবহ ক্ষতিকর কয়লা বিদ্যুৎপ্রকল্প। রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, সিমেন্ট কারখানাসহ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শত শত কারখানা স্থাপন করে সুন্দরবনকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে মৃত্যুর মুখে। প্রাণ- প্রকৃতি-পরিবেশ ধ্বংস করে মুষ্টিমেয়ের সম্পদ বৃদ্ধির নামই তারা দিয়েছে ‘উন্নয়ন’। সে ‘উন্নয়ন’ এর চাপায় প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ ধ্বংস হলেও, তাদের কিছু যায় আসে না। পতেঙ্গা বিচকে ইজারা দিতে পারলে, আগামীকাল কক্সবাজার বিচকেও ইজারা দেওয়ার আয়োজন শুরু হবে। ফলে আজ সারাদেশের জনগণকেই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

ইতোমধ্যে বাসদ(মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলা শাখা পতেঙ্গা সি বিচ ইজারাদান ও প্রবেশমূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্তের বাতিলের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে। প্রচারপত্র বিলি করে জনমত গড়ে তোলার কাজ চলছে। এর অংশ হিসেবে গত ৩ ডিসেম্বর পতেঙ্গা সি বিচে প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। প্রতিবাদ সমাবেশের বক্তব্য শুনে বিচে বেড়াতে আসা সাধারণ মানুষ সিডিএ’র এ গণবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।

সাম্যবাদ

ডিজেল-কেরোসিনসহ নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বাসদ (মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে দাবি সপ্তাহ পালিত

ঢাকা

ময়মনসিংহ

সিলেট

ডিজেল-কেরোসিনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি এবং আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহবান জানিয়ে ৬-১২ ডিসেম্বর বাসদ (মার্কসবাদী) দলের উদ্যোগে দাবি সপ্তাহ পালিত হয়েছে। দাবি সপ্তাহ উপলক্ষে সারাদেশে দলের উদ্যোগে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসব সমাবেশে বক্তারা বলেন- করোনা মহামারীর কারণে সারাদেশে নতুন করে ৩ কোটি মানুষ দরিদ্র হয়েছে। মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকার হয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে একের পর এক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি করছে সরকার। সর্বশেষ গত ৪ নভেম্বর ডিজেল কেরোসিনের মূল্য প্রতি লিটারে ১৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে। বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে দাম বাড়ালেও গত ৫ বছর আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য কম থাকলেও আমাদের দেশে তখন মূল্য কমানো হয় নি। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি করেছে মালিকরা। এর ফলে নতুন করে সকল পণ্যের দাম আবার বাড়বে। এভাবে মূল্যবৃদ্ধির ফলে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ জনগণ আজ দিশেহারা। অথচ সরকার সাধারণ জনগণের স্বার্থ বিবেচনা করছে না। সরকার গত সাত বছরে জ্বালানি খাত থেকে ৪৩ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করেছে। কিন্তু এখন তারা সে টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে না। তাহলে সে টাকা গেল কোথায়?

বক্তারা বলেন-ওএই সরকার উন্নয়নের নামে লুটপাট দূর্নীতির মহোৎসব শুরু করেছে। লুটপাটের ফলে ঘাটতি টাকা উত্তোলনের জন্য তেল,গ্যাস,বিদ্যুৎ এর মূল্য বৃদ্ধি, ভ্যাট-ট্যাক্স সহ সকল পণ্যের দাম বৃদ্ধি করছে। বাস্তবে এই সরকার হচ্ছে লুটপাটকারী মাফিয়া ধনিকদের সরকার। দূর্নীতি লুটপাটের বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিবাদ করলে তাদের উপর চলছে নিপীড়ন নির্যাতন। দেশে আওয়ামীলীগ সরকার ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছে। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পারে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে। বাসদ (মার্কসবাদী) জনগণের প্রতি সেই আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে দাবি সপ্তাহ পালন করছে।

নিম্ন আয়ের মানুষোর জন্য রেশনের দাবিতে রংপুরে অবস্থান ধর্মঘট

নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের দাম কমানো ও টিসিবির পণ্যে প্যাকেজ সিস্টেম বাতিল, নিম্ন আয়ের মানুষোর জন্য রেশনের দাবিতে রংপুরে অবস্থান ধর্মঘট

গত ১২ডিসেম্বর, ২০২১ বাসদ(মার্কসবাদী),রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গ্রাম-শহরে শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু, টিসিবির পণ্য বিক্রিতে প্যাকেজ সিস্টেম বন্ধ, বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার ও ভোজ্যতেল, চাল, ডাল, আটা, চিনিসহ সকল খাদ্যপণ্য, এলপিজি গ্যাস, ডিজেল ও কেরোসিনের দাম কমানোর দাবিতে রংপুর প্রেসক্লাব চত্বর থেকে বিক্ষোভ -মিছিল করে কাচারি বাজার, ডিসি অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্টি রংপুর জেলার সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু। বক্তব্য রাখেন পার্টির জেলা কমিটির সদস্য আহসানুল আরেফিন তিতু, বাংলাদেশ শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন জেলার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ বাসফোর, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট মহানগরের আহ্বায়ক সাজু বাসফোর প্রমুখ। বক্তারা বলেন, দেশে চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, জ্বালানি তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির ফলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। সরকার এদের নিয়ন্ত্রণ না করে অবাধ লুটপাটের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। করোনা মহামারীর কবলে পড়ে একদিকে বেকারত্ব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে মানুষের জীবন বাঁচানোই দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। তাই অবিলম্বে দ্রব্যমূল্য কমানো, টিসিবির পণ্যের দাম কমিয়ে পর্যাপ্ত বিক্রির পাশাপাশি সকল শ্রমজীবী-নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য রেশন চালু জরুরী হয়ে পড়েছে। বাসদ(মার্কসবাদী)'র অবস্থান ধর্মঘট থেকে অবিলম্বে এসব দাবি বাস্তবায়নের জন্য দাবি জানানো হয়। এছাড়া রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কলেজপাড়া, সেনপাড়াসহ বিভিন্ন জায়গায় ভূমিদস্যুরা গরীব মানুষকে বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে জমি দখলের পায়তারা করছে। এসব ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

বাসদ (মার্কসবাদী)'র বিশেষ সাংগঠনকি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠিত

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র বিশেষ সাংগঠনিক সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর ২০২১ দলের সারাদেশের সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় কমরেড মানস নন্দীকে আহ্বায়ক ও কমরেড মাসুদ রানাকে সদস্যসচিব করে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট 'বিশেষ সাংগঠনিক সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি' গঠন করা হয়। প্রস্তুতি কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন: কমরেডস আলমগীর হোসেন দুলাল, মোস্তফা ফারুক, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, উজ্জ্বল রায়, হাসিনুর রহমান, জহিরুল ইসলাম, আহসানুল হাবীব সাঈদ, জসীম উদ্দীন, শফিউদ্দিন কবির আবিদ, আনোয়ার হোসেন বাবলু, নাঈমা খালেদ মনিকা, সীমা দত্ত, শেখর রায়, মহিউদ্দিন মহির, ফাতেমা ইয়াসমিন ইমা, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, রাজু আহমেদ, তসলিমা আক্তার বিউটি, মাসুদ রেজা, আহসানুল আরেফিন তিতু, দোলন রায়, জয়দীপ ভট্টাচার্য্য, রাশেদ শাহরিয়ার, ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা, আসমা আক্তার, বিটুল তালুকদার, শফিকুল ইসলাম, রহিমা আক্তার কলি।

দলের আদর্শিক-সাংগঠনিক গঠনপ্রক্রিয়াকে গতিশীল ও দলীয় সংগ্রামের পরিপূরক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে এই বিশেষ সাংগঠনিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই বিশেষ সাংগঠনিক সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দলের নির্বাহী দায়িত্ব 'বিশেষ সাংগঠনিক সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি' পালন করবে।

চাঁদপুরের হাইমচরে ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করে ইকোনমিক জোন করার প্রতিবাদ

বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন চাঁদপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে হাইমচরের নিউচরের স্থানীয় নেতৃত্বে উদ্যোগে ৩ দিনের নানা-বিধ কর্মসূচি পালন করা হয়। বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আলমগীর হোসেন দুলাল ও কৃষক সংগঠনের জেলা সংগঠক জিএম বাদশার উপস্থিতিতে সমাবেশ, জনসংযোগ, সাংগঠনিক পরিকল্পনা, সংগঠনের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ, নারী-ছাত্র-শিশু কিশোরদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। যদিও নিম্নচাপের ফলে টানা বৃষ্টিতে ঘোষিত জনসভা করা যায়নি। গুচ্ছগ্রামে শুরু হওয়া সমাবেশ মাঠে আর করা যায় নি, চায়ের দোকানের দুপাশে লম্বা ছাউনিতে সম্পন্ন করা হয়। ভূমিহীন নেতা নূর হোসেন রাঢ়ীর সভাপতিত্বে সমাবেশ পরিচালনা করেন সংগঠক দুলাল সর্দার, বক্তব্য রাখেন জয়নাল রাঢ়ী, কৃষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাসদ (মার্কসবাদী) চাঁদপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল। নেতৃবৃন্দ কৃষকদের জীবনের বিভিন্ন সংকট নিয়ে আলোচনা করেন এবং সংকট নিরসনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান।

সরকার ঘোষিত ইকোনমিক জোন প্রসঙ্গে কমরেড দুলাল বলেন, নিউচরসহ হামচরের চরগুলো ভূমিহীন চরবাসীর অক্লান্ত পরিশ্রমে উর্বর শস্যভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। চরবাসী ধান, কলাই, সয়াবিন, সবজী, ফলমূল উৎপাদন করে জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যে ভূমি ইতোমধ্যে জাতীয় অর্থীতিতে ভূমিকা রাখছে তাকে নতুন করে অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করবে কি? প্রকৃতপক্ষে ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করে ৮০০০ হাজার একর ভূমি ধনীদের মুনাফার ভাণ্ডার তৈরির প্রজেক্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। হাজার হাজার ভূমিহীনকে ঘরহারা জমিহারা অনিশ্চিত জীবনে ঠেলে দেয়ার প্রজেক্টই হচ্ছে আজকের হাইমচরের চরগুলোতে ইকোনমিক জোন। নেতৃবৃন্দ বলেন সমস্ত শক্তি দিয়ে এই চর রক্ষা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ লড়াই।

গাইবান্ধার গিদারীতে বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা প্রভাষক গোলাম সাদেক লেবুসহ নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের নামে দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র এক বিবৃতিতে সদ্যসমাপ্ত গিদারী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দিন সংঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবন্ধা জেলা কমিটির সদস্য প্রভাষক গোলাম সাদেক লেবু, সিপিবি জেলা সভাপতি মিহির ঘোষসহ বাসদ (মার্কসবাদী) কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের নামে দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, "গত ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত গাইবান্ধা সদর উপজেলার গিদারী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেশের বেশিরভাগ জায়গার মতো ভোটডাকাতি করে নৌকা মার্কার প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। গিদারী ইউপি-র ৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩টি কেন্দ্রে ভোটারদের প্রকাশ্যে নৌকায় সিল মারতে বাধ্য করা হয়েছে। নৌকার প্রার্থী গতবারের চেয়ারম্যান হারুনুর রশিদ ইঁদু তার বাড়িসংলগ্ন কেন্দ্রসহ তিনটি কেন্দ্রে জবরদস্তি ভোট জালিয়াতিতে নেতৃত্ব দেন। এরপরও বিজয় নিশ্চিত করবার জন্য ভোটের দিন বিকেলে তিনি দলবলসহ কাউন্সিলর বাজার এলাকার ভোটকেন্দ্রে গিয়ে হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রে ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণায় বাধা সৃষ্টি করে ব্যালট বাক্স উপজেলা সদরে নিয়ে যাওয়া। এই সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়ো হওয়া শত শত এলাকাবাসীর সাথে ইঁদু সাহেবের লোকজনের সংঘর্ষ হলে গণপিটুনিতে তিনি আহত হন। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, বাসদ (মার্কসবাদী) কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ এলাকাবাসীকে জড়িয়ে ছয়দিন পর তিনি প্রতিহিংসামূলক মামলা দায়ের করেছেন। এতে এক নম্বর আসামি করা হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোটরসাইকেল প্রতীকের প্রার্থী জননেতা গোলাম সাদেক লেবুকে। আরো আসামি করা হয়েছে সিপিবি জেলা কমিটির সভাপতি জননেতা মিহির ঘোষ, ঘোড়া মার্কার প্রার্থী মতিয়ার রহমান, কাস্তে মার্কার প্রার্থী সাদেকুল ইসলাম, বাসদ (মার্কসবাদী) দলের স্থানীয় কর্মী-সমর্থক শাহজালাল তোতা, রঞ্জু, রাজু, খালেকসহ ৬৯ জনকে। অজ্ঞাতনামা আরও ২/৩শত এলাকাবাসীকে আসামি করা হয়েছে। ভোটডাকাতিকে আড়াল করা এবং বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করে আগামীদিনে দুর্নীতি-লুটপাটের রাস্তাকে নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে এই ষড়যন্ত্রমূলক, হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে।"

বিবৃতিতে আরো বলা হয় "ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে জননেতা গোলাম সাদেক লেবু এলাকাবাসীর অনুরোধে মোটরসাইকেল প্রতীক নিয়ে এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২০১১-১৬ ইউপি চেয়ারম্যান থাকাকালে ভিজিএফ-ভিজিডি-বয়স্ক ভাতা-বিধবা ভাতার কার্ড বিতরণে স্বচ্ছ তালিকা প্রণয়ন করে ইউনিয়ন অফিসে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে সবাই যাচাই করতে পারে - সত্যিকার গরিব মানুষ এসব সরকারি সাহায্য পাচ্ছে কি না। তার অনন্য ভূমিকা ছিল গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠায়। তিনি মাদক, জুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। তার সময়ে কোনো প্রয়োজনে যে কেউ চেয়ারম্যানকে হাতের নাগালে পেয়েছে। পাঁচ বছর চেয়ারম্যান থেকে তিনি সম্পদের পাহাড় গড়েননি, বরং সুন্দরগঞ্জের ধর্মপুর ডিগ্রি কলেজে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসাবে কর্মরত থেকে সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনযাপন করেন। এবারের নির্বাচনে জনগণ সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা করে লেবু ভাইয়ের মোটরসাইকেল প্রতীকের পক্ষে জনজোয়ার সৃষ্টি করে। ভোটাররাই টাকা পয়সা দিয়ে তাকে সহায়তা করেছে। গোলাম সাদেক লেবুর নির্বাচনী বক্তব্য ছিল - কৃষি ঋণ-পল্লী বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিলের সংকট নিরসন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-দুস্থ-প্রতিবন্ধীদের ভাতা বাড়ানোর দাবি, দিনমজুরদের কাজের দাবি, সরকারি সাহায্য বেচাকেনা বন্ধের দাবি, জন্মনিবন্ধন নিয়ে হয়রানি বন্ধ, বিচার-সালিসে টাকার প্রভাব বন্ধ, ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারে ডাক্তার-ঔষধের দাবি, পারিবারিক কলহ নিরসনের উদ্যোগ, মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে পর্যাপ্ত ওএমএস-টিসিবি গ্রাম পর্যন্ত কার্যকর করার দাবি, যুবক-তরুণদের অবক্ষয় ঠেকাতে পাঠাগার-খেলার মাঠ গড়ে তোলা, নারী-শিশু নির্যাতন ঠেকাতে কার্যকর উদ্যোগ, সর্বোপরি দুর্নীতিমুক্ত কার্যকর জনবান্ধব ইউনিয়ন পরিষদ গড়ে তোলা। তার অঙ্গীকার ছিল - ইউনিয়নবাসীকে সাথে নিয়ে তিনি জিতলেও লড়বেন, হারলেও লড়বেন। সরকারদলীয় প্রার্থীর টাকা, ক্ষমতা ও পেশীশক্তির দাপট সত্ত্বেও স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থনে গোলাম সাদেক লেবু-র বিজয় ঠেকাতেই ভোটডাকাতি ও পরবর্তীতে হামলা-মামলা করা হয়েছে।"

আবুল কালামের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

কমরেড আবুল কালাম কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার অত্যন্ত দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৮ সালে পার্টির সংস্পর্শে আসেন। দারিদ্র্যের কারণে ছোটবেলায় আরও অনেকের মতো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিতে সক্ষম হননি। কিশোর বয়সেই তাঁকে পারিবারিক আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে আয়-উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। যতটুকু সময় পেতেন পার্টি অফিসে নেতাদের সাথে কথা বলা, প্রোগ্রামে থাকা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে তিনি হোসেনপুর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পার্টি অন্তঃপ্রাণ এ কমরেডটি পার্টি নিয়ে অত্যন্ত গৌরববোধ করতেন। পার্টি ছিল তাঁর হৃদয়ের মণিকোঠায়। হতদরিদ্র পরিবারের সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব পালন করেও যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হতেন। বিপ্লবের সাথে, শ্রেণির সাথে, দলের সাথে ছিল সুগভীর একাত্মতা। এটা বোঝা যেত, নেতা-কর্মীদের প্রতি তাঁর ভীষণ ভালোবাসার প্রকাশ দেখে। নিজের খাবারের সংস্থান নেই, অথচ নেতারা এলে কী খাবে–এ নিয়ে তাঁর সবসময় চিন্তা! তাঁর মর্যাদাবোধ ছিল উঁচু তারে বাঁধা। অন্যান্য দল যখন তাঁকে পদের লোভ দেখাত, তিনি বলতেন, 'তোমরা শোষকের দল, পুঁজিবাদের দল, তোমাদের দলের নেতা হয়ে অপরাধী হব না। আমি বরং বিপ্লবী পার্টির কর্মী হওয়াটা গৌরবের মনে করি।' দল ছোট বলে বিরোধী পক্ষ বিদ্রুপ করলে গায়ে মাখতেন না, কিন্তু উপযুক্ত জবাব দিতেও কসুর করতেন না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চেনা-জানা নেই, অথচ একা একাই পায়ে হেঁটে দলের প্রচার করতেন। এমনি বিভিন্ন জায়গায় গ্রামীণ নারীদের নিয়ে বৈঠক করতেন। মহিলারা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখত। পার্টি কমরেডরা সম্মিলিতভাবে চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি বলেছিলেন পার্টি যেটা করতে চায়, তাই করতে রাজি। তিনি পারিবারিকভাবে গ্রামীণ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। গত ১৩ নভেম্বর ২০২১ আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। পার্টি কমরেডদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যথাযথ চিকিৎসার অভাবে তাঁকে আরও কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখা গেল না।

কমরেড আবুল কালাম লাল সালাম!

বীর কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে মুক্তিযুদ্ধের কিশোর পাঠ অনুষ্ঠিত

শিশু কিশোর মেলা এবং শহীদ রুমী স্কোয়াড এর যৌথ উদ্যোগে শিশু কিশোরদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানাবার লক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২১, শুক্রবার, সকাল ৯ টায় 'মুক্তিযুদ্ধের কিশোর পাঠ' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য বীর প্রতীক হাবিবুল আলম। বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার। সভাপতিত্ব করেন ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা নগর শাখার সভাপতি এবং শহীদ রুমী স্কোয়াড এর সংগঠক রাফিকুজ্জামান ফরিদ। হাবিবুল আলম তার উদ্বোধনী বক্তব্যে ক্র্যাক প্লাটুন-এর গেরিলা যোদ্ধাদের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বই এর পাশাপাশি জ্ঞান বিজ্ঞানের নানান বই পড়া, ইতিহাস চর্চার কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মীরপুর, কড়াইল, কামরাঙ্গীরচর, শ্যামলী, সূত্রাপুর অঞ্চলসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় গান, নৃত্য, নাটক, বিতর্ক, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিজ্ঞান কর্মশালা, পুরস্কার বিতরণী এবং অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য

গত ২ জানুয়ারি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার-এর পরিচালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মাসুদ রানা। বৈঠকে সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় সংগঠনের সহ-সভাপতি ডা: জয়দীপ ভট্টাচার্যকে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

বৈঠকে আগামীদিনে শিক্ষার ওপর শাসক শ্রেণীর সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর

নারীমুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে রংপুরে রোকেয়া দিবস পালিত

মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার ১৪১তম জন্ম ও ৮৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে র‍্যালী ও শহরস্থ রোকেয়ার ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সকাল ১১ টায় রংপুর প্রেসক্লাব থেকে র‍্যালী শুরু হয়ে শহরের

প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে রোকেয়ার ভাস্কর্যের পাদদেশে শেষ হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি রংপুর জেলার সংগঠক এবং কেন্দ্রীয় সদস্য এ্যাডভোকেট কামরুন্নাহার খানম শিখা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ শেষে তিনি বলেন, রোকেয়ার স্বপ্নের নারী-পুরুষের সমমর্যাদার সমাজ আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনো সমাজে নারীরা পুরুষের লালসার শিকার। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধা সকলে আজও পুরুষশাসিত দৃষ্টিভঙ্গির যুপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে। নারীরা সম্পত্তিতে সম অধিকার পায়নি। সমকাজে সমমজুরী নারীরা পায় না। এভাবে ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারীরা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়। তাই রোকেয়ার স্বপ্নের সমাজ প্রতিষ্ঠায় তার সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে।

সাম্যবাদ

পুঁজিপতিদের মুনাফা লিপ্সার শিকার প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ

বিচ্যুত হয়েছি। সুতরাং, আমি সম্মেলনের ফলাফলকে হতাশাজনক বলে বর্ণনা করছি।" মূলত যে চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা দুর্দান্ত শব্দ দিয়ে ভরপুর কিন্তু সেগুলি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কে কোনও বাস্তব ধারণা দেওয়া হয়নি। এর কারণ হলো শাসকগোষ্ঠী মুনাফা উৎপাদন কমিয়ে পরিবেশের উন্নতি করতে একদমই আগ্রহী না। একইসাথে আমাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের ভণ্ডামির দিকেও নজর দিতে হবে। বন উজাড় বন্ধে আন্তর্জাতিক ঘোষণার সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার একাত্মতা প্রকাশ করেনি। কারণ সরকার যতই মুখে পরিবেশ রক্ষার কথা বলুক, বাস্তবে তারা রামপাল বিদ্যুকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুন্দরবন ধ্বংস করছে। নদী-নালা দখল করছে, শহরের আশেপাশে দূষণকারী ইটভাটা প্রতিষ্ঠা করছে। ব্যবসায়ীদের মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন 'উন্নয়ন' প্রকল্প অহরহ পরিবেশ ধ্বংস করে যাচ্ছে, এই প্রকল্পগুলো সরকার বন্ধ করতে চায় না ফলে বন উজাড় বন্ধের চুক্তিতে সেই করেনি। অর্থাৎ দেশে সুন্দরবন ধ্বংসের প্রজেক্ট ও কার্বন নিঃসরণের উৎস রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ ও অন্যান্য কয়লা ভিত্তিক কেন্দ্র চালু রেখে রেখে পুরো বিশ্বকে জলবায়ু পরিবর্তন রোধের আহবান জানাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার!

বর্তমানে বিশ্ব মানবতা এক ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। পুরো পৃথিবী উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে, বিশ শতকের তুলনায় একবিংশ শতকে পৃথিবীর উপরিতলের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি বেড়ে গিয়েছে। শুনে কম মনে হলেও এর প্রভাব খুবই বিপর্যয়কারী। এর কারণে শুষ্কতা বেড়ে যাওয়ায় জঙ্গলগুলো পুড়ছে, ক্যালিফোর্নিয়া দাবানলে ২০২০ সালে ৪ মিলিয়ন একরেরও বেশি বন পুড়ে গেছে। ২০২১ সালে আলজেরিয়া, দক্ষিণ তুরস্ক এবং গ্রীসসহ অন্যান্য অঞ্চলেও বড় দাবানল ঘটেছে। গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিউনিসিয়ার কাইরুয়ান শহরে গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা রেকর্ড পরিমাণ ৫০.৩ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে, ফলে শহরের লোকজন দিনের বেলা বের হতে পারছে না। জর্জিয়া, তুরস্ক, সিসিলি, স্পেন, কানাডা ইত্যাদি দেশও রেকর্ড করেছে। দেশে দেশে খরা দেখা দিচ্ছে। মাদাগাস্কারের খরা দুর্ভিক্ষে পরিণত হতে যাচ্ছে। বর্তমান ব্রাজিলের রেকর্ড পরিমাণ খরা কফির উৎপাদন ২৩ শতাংশ কমিয়ে দিবে। গরম যেরকম বাড়ছে, উল্টো দিকে শীতের তীব্রতাও বাড়ছে। যত বেশি তাপমাত্রা বাড়ছে, ততই বেশি পরিমাণ বরফ গলে যাচ্ছে। গত ত্রিশ বছরে উত্তর মেরু থেকে পাঁচটা বাংলাদেশের সমপরিমাণ বরফ গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একই সময়ে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ থেকে তিন ট্রিলিয়ন বরফ গলে গিয়েছে, এই হারে বরফ গলতে থাকলে আগামী ৪০ বছরে অ্যান্টার্কটিকা বরফশূন্য হয়ে পড়বে। বরফ গলে সেটা পানিতে পরিণত হয়ে মহাসাগরে মিশে যায়, ফলে সাগরের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৩ এবং ২০০২ এর মধ্যে বৈশ্বিক গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২.১ মিমি বৃদ্ধি পেতো প্রতি বছর এবং ২০১৩ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৪.৪ মিমি বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধির হার ২ গুণ বেড়েছে। এতে নিম্ন অঞ্চলগুলো পানিতে ডুবে যাচ্ছে এবং গড় তাপমাত্রা কমানো না গেলে এই শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে এই কারণে বিশ্বব্যাপী কয়েক মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। পৃথিবীতে মোট তরল পানির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বাড়ছে। এই বছরের ২০ জুলাই, ঝেংঝো শহরে এক ঘন্টায় ২০১.৯ মিমি বৃষ্টি হয়েছে (এটি চীনা জাতীয় রেকর্ড)। ২০২১ সালের জুলাই মাসে পশ্চিম ইউরোপ এবং চীনে ভয়াবহ বন্যা হয় যার ফলে শত শত মানুষ মারা যায়, লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হয় এবং বিলিয়ন বিলিয়ন মূল্যের অবকাঠামো ধ্বংস হয়। শুধু ভূমির নয়, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রারও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্কটিকের ল্যাপটেভ এবং বিউফোর্ট সাগর জানুয়ারী থেকে এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত 'তীব্র' এবং 'চরম' সামুদ্রিক তাপপ্রবাহের সম্মুখীন হয়েছিল। এতে সামুদ্রিক জীব-বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত হওয়ার সাথে সাথে যে অসাধারণ গরম এবং ঠাণ্ডা তাপমাত্রা আরও সাধারণ হয়ে উঠছে তা প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী ৫ মিলিয়ন মৃত্যুর জন্য দায়ী। ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সমস্ত মৃত্যুর ৯.৪% জন্য চরম আবহাওয়া দায়ী। ২০১৯ সালের প্রথমার্ধে, ৭ মিলিয়ন মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে (নিজের দেশে) চরম আবহাওয়ার কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় শস্যের উৎপাদন কমে গিয়ে খাবারের অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০২০ সালে, আগের বছরের তুলনায় খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত জনসংখ্যা প্রায় ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি। গত ৫০ বছরে (১৯৬৮-২০১৮) দেশে দিন ও রাতে উষ্ণতার হার বেড়েছে। বরিশাল, দিনাজপুর, ফরিদপুর ও রাজশাহীতে বার্ষিক ভারী বর্ষণের দিন উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ফলে উত্তরবঙ্গের এলাকাগুলোয় খরা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। নগর এলাকাগুলোতে ভারী ও চরম বৃষ্টিপাতের দিনের সংখ্যা বাড়ছে, প্রকট হচ্ছে জলাবদ্ধতা। এটা স্পষ্ট যে গত কয়েক দশকে বন্যার সংখ্যা, মাত্রা এবং সময়কাল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে ০.৫-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণ হবে, যদি নির্গমন বর্তমান হারে চলতে থাকে; এছাড়াও জলবায়ু মডেল ইঙ্গিত দেয় যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে গড় মৌসুমী বৃষ্টিপাত সম্ভবত ১০-১৫% বৃদ্ধি পাবে।

২০১৮ সালে আবহাওয়ার আকস্মিক ও চরম ঘটনার জন্য দেশে প্রাক্কলিত অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ২ দশমিক ৮৩ বিলিয়ন ডলার। প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাস্তুচ্যুত অবস্থায় রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্যানেল আইপিসিসি (ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) তাদের সাম্প্রতিক (আগস্ট ২০২১) রিপোর্টে বলছে "এই শতকের মধ্যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ না করা হলে পৃথিবী অস্তিত্বের সংকটে পড়বে"। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গ্যুতেরেজ জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান অবস্থাকে 'মানবতার জন্য কোড রেড' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তাহলে পৃথিবীর এই অবস্থার জন্য দায়ী কী বা কে?

মূলত বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউজ গ্যাস বিশেষত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় তাপমাত্রা বাড়ছে কারণ এই গ্যাসগুলো তাপ ধরে রাখতে পারে। ১৭৫০ সালে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর ঘনমাত্রা ছিল ২৮০ পিপিএম কিন্তু বর্তমানে তা ৪১১ পিপিএম অর্থাৎ ৪৭ শতাংশ বেড়েছে। আইপিসিসি এর রিপোর্ট বলছে "এই বৃদ্ধি দ্ব্যর্থহীনভাবে মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা সৃষ্ট"। পরিসংখ্যান বলছে বিশ্বব্যাপী গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমণের প্রাথমিক উৎস হল বিদ্যুৎ এবং তাপ উৎপাদন (৩১%), কৃষিকাজ (১১%), পরিবহন সেক্টর (১৫%), অন্যান্য পণ্য উৎপাদন (১২%) ইত্যাদি। কারখানাগুলো পরিবেশের তোয়াক্কা না করে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ছেড়ে দিচ্ছে। একইসাথে আমরা এখানে কিছু অসমতা দেখতে পাবো। পৃথিবীর ১ শতাংশ ধনিকগোষ্ঠী ১০ শতাংশ অতি দরিদ্রদের তুলনায় ১৭৫ গুণ বেশি কার্বন নিঃসরণ করতে সাহায্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ও রাশিয়া- মাত্র এই চারটি দেশ ৫৫% নিঃসরণের জন্য দায়ী। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো। আবার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ১০০ কোম্পানি মোট ৭০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী। অর্থাৎ ধনীরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে গরীবরা; সাম্রাজ্যবাদী ও উন্নত দেশগুলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করবে এবং বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো।

সমাধানের জন্য আমাদেরকে বর্তমান পরিবেশগত বিপর্যয়ের মূল কারণ চিহ্নিত করতে হবে। সেই মূল কারণ হলো আমরা যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে বাস করি- পুঁজিবাদ।

এই ব্যবস্থায় জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্য ব্যক্তিমালিকানার অধীনে বিক্রির জন্য উৎপন্ন হয়। মালিকরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে পণ্য উৎপাদন করে শুধুমাত্র বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং সেই মুনাফা আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে সামগ্রিক মুনাফার সম্প্রসারণ ঘটায়। এখানে দুটো বিষয় পুঁজিবাদের চালিকা শক্তি ১. সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন ২. সম্প্রসারণ। প্রতিযোগিতার কারণে টিকে থাকতে মালিকরা যেকোনো মূল্যে ও পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে সদা প্রস্তুত। মুনাফা হিসাব করার সময়ে তারা প্রকৃতির ক্ষতিগুলো বিবেচনা করবে না কারণ প্রকৃতি তাদের কাছে ইচ্ছেমতো ব্যবহারের জন্য এক ধরনের উপহারের মতো। উল্টো প্রকৃতির কথা চিন্তা করলে মুনাফার পরিমাণ কমে যাবে। কারখানায় উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরাসরি বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেওয়া ও প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিশোধিত করে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে প্রথমটাই কম খরচের ফলে মালিকরা সেটাই করার চেষ্টা করবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য মালিকদেরকে নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হয়। এই শেষহীন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তারা নির্দ্বিধায় বন-জঙ্গল উজাড় করে দেয়।

বাস্তবে তাদের কাছে প্রকৃতি হলো দখল ও লুণ্ঠন করার মতো পণ্য। এরূপ সম্প্রসারণ বাদে এই ব্যবস্থা টিকতেও পারবে না। তাছাড়া পুরো পৃথিবীতে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয় অপরিকল্পিতভাবে, মানুষের চাহিদার বদলে প্রাধান্য পায় পুঁজিপতিদের মুনাফা। ফলে যতটুকু পণ্য লাগবে তার থেকে অনেক বেশিই উৎপন্ন হয়। যেমন: একটা নির্দিষ্ট দেশে যতটুকু স্টিল লাগবে, সেই দেশে অবস্থিত প্রত্যেক কোম্পানিই ততটুকু স্টিল উৎপাদন করার চেষ্টা করবে। ফলে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি উৎপন্ন হবে। এতে দেখা যাবে সামগ্রিকভাবে বেশি পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হবে। অর্থাৎ মৌলিকভাবে পুঁজিবাদী কাঠামোই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। জলবায়ু সমস্যা সরাসরি পৃথিবী ও মানব প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয় না, হয় আমাদের সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ চালনা থেকে।

তাহলে আইন ও নতুন প্রযুক্তি দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়? আমাদের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিপতি শ্রেণি। ফলে বেশিরভাগ আইন পুঁজিপতিদের স্বার্থেই প্রণীত হয়। বেশিরভাগ উন্নত দেশে কার্বন নিঃসরণ বিষয়ক কঠোর আইন থাকলেও নিঃসরণের হার কমছে না বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ যেকোন পরিবেশগত আইন বা প্রবিধান সর্বদা স্বল্পমেয়াদী, পুঁজির চাহিদা অনুযায়ী অকার্যকর থাকবে এবং পরিবর্তিত হবে।

পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করে জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণ রোধ করার। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেকোনো প্রযুক্তি শেষমেষ পুঁজির আওতায় এসে ব্যবসায়িক রূপ ধারণ করবে।

ফলে পুঁজিপতিরা নিজের মতো করে ব্যবহার করবে। যখনই তাদের মৌলিক কাঠামোর সাথে প্রযুক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হবে তখনই প্রযুক্তির ব্যবহার কমে যাবে বা পুঁজিপতিরা নতুন লাভজনক প্রযুক্তি তৈরি করে সেটাকে অকার্যকর করে দিবে। একারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্বন পরিশোধিত করে ছেড়ে দেওয়ার প্রযুক্তির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তন কমছে না।

ফলে এটা স্পষ্ট যে এই ব্যবস্থার অধীনে যেকোনো ধরনের আইন, প্রযুক্তি, সংস্কার ইত্যাদি শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থার স্বার্থই রক্ষা করবে। আবার যেহেতু এই ব্যবস্থা চলতে হলে পরিবেশের ক্ষতি হতে বাধ্য। ফলে এই ব্যবস্থার উৎখাত বাদে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ বা পরিবেশ বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব না।

কৃত্রিমভাবে উদ্দীপিত প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অপচয় এবং চরম অসমতার এই অযৌক্তিক ব্যবস্থাকে উল্টে দিতে হবে যদি আমরা একটি পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং প্রকৃত সমতার সমাজ তৈরি করতে চাই। এটিই একমাত্র সমাধান।

কক্সবাজারে ধর্ষণের ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০২১ কক্সবাজারে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এর বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্তের সভাপতিত্বে ও ছাত্র ফ্রন্ট সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ারের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট সভাপতি মাসুদ রানা ও দপ্তর সম্পাদক সালমান সিদ্দিকী।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিনের বিচারহীনতার সংস্কৃতি, ক্ষমতার ছত্রছায়ায় অপরাধীদের আশ্রয়, নারীকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে উপস্থাপনা ফলাফলেই কক্সবাজারের মত ঘটনার সৃষ্টি করে। আমরা অতীতে দেখেছি এসব ঘটনার সাথে যুক্ত অপরাধীরা ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থাকে। কক্সবাজারের ঘটনায়ও আমরা অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখলাম।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কক্সবাজারে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনা এই সমাজব্যবস্থায় যে অবক্ষয়ের চিত্র তা আমাদের সামনে দৃশ্যমান করেছে। এই অবক্ষয়ের হাত থেকে সমাজকে বাচাতে হলে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া সম্ভব নয়। সেই সমাজপরিবর্তনের লক্ষে ধষণ বিরোধী আন্দোলনগুলো আমাদের জোরদার করতে হবে। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল শাহবাগ থেকে টিএসসিতে প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়।

শোষকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও সচেতন গণ-সংগ্রামের মধ্যেই সাম্যবাদীর সমস্ত নীতিবোধ নিহিত

পুঁজিপতিদের যে সেবকের প্রয়োজন ছিলো, তা উৎপাদন করতো পুরনো বিদ্যালয়গুলো। পুরনো বিদ্যালয়গুলো বিজ্ঞানীদের পরিণত করেছিলো পুঁজিপতিদের খুশি করার জন্য লেখা ও বলার লোক হিসেবে। আমরা অবশ্যই এর বিলোপ ঘটাবো। কিন্তু এগুলোর বিলোপ বা ধ্বংস করার মানে কি এই যে, মানুষের প্রয়োজনীয় যা কিছু মানবজাতি সঞ্চয় করেছে সেগুলো এদের কাছ থেকে নেব না? এর অর্থ কি এই যে, পুঁজিবাদের জন্য কী প্রয়োজন ছিল, আর সাম্যবাদের জন্য আজ কী প্রয়োজন তার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে না?

বুর্জোয়া সমাজের চালু করা বেশিরভাগ জনগণের ইচ্ছাবিরোধী জোর করে চাপানো অনুশাসন পদ্ধতিকে আমরা শ্রেণিসচেতন শ্রমিক কৃষকের শৃঙ্খলার দ্বারা প্রতিস্থাপিত করছি। যারা পুরনো সমাজের প্রতি ঘৃণার সাথে দৃঢ় সঙ্কল্প, নিজেদের সামর্থ্য এবং তৎপরতাকে যুক্ত করছে এই সংগ্রামে নিজেদের শক্তিকে সংহত ও সংগঠিত করার জন্য। এইভাবেই তারা বিশাল দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছাকে সংহত করে সংগ্রামের একটিমাত্র ইচ্ছারূপে সংগঠিত করবে। এ না হলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই সংহতি, শ্রমিক-কৃষকের এই সচেতন শৃঙ্খলা ছাড়া আমাদের সংগ্রামের কোন আশা নেই। এছাড়া আমরা সারা দুনিয়ার পুঁজিপতি ও জমির মালিকদের পর্যুদস্ত করতে পারব না। নতুন সমাজের ভিত্তিটাকেও মজবুত করতে পারব না, তার ওপর দাঁড়িয়ে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলা তো দূরের কথা। সেই কারণেই পুরনো বিদ্যালয়কে নিন্দা করে, ন্যায়সঙ্গতভাবেই তার বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করা এবং তাকে ধ্বংস করার আগ্রহকে স্বাগত জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, আমরা পুরনো শিক্ষাপদ্ধতি, মুখস্থবিদ্যা এবং জবরদস্তির বদলে অর্জন করবো মানব সমাজের দ্বারা আহরিত সামগ্রিক জ্ঞানকে আয়ত্ত করার সামর্থ্য। এই সামর্থ্য এমনভাবে অর্জন করতে হবে যাতে সাম্যবাদ মুখস্থবিদ্যা হয়ে না দাঁড়ায়। এটা যেন তোমাদেরই ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে বর্তমান শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত অপরিহার্য সিদ্ধান্ত হয়ে ওঠে।

. . . একজন সাম্যবাদ শিখতে পারে তখনই, যদি সে শোষণমূলক পুরনো সমাজের বিরুদ্ধে সর্বহারা ও শ্রমজীবী জনগণের ধারাবাহিক সংগ্রামের সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে নিজের অধ্যয়ন, অনুশীলন ও শিক্ষাকে যুক্ত করে। লোকে যখন আমাদেরকে নৈতিকতার কথা বলে, আমরা বলি, শোষকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও সচেতন গণ-সংগ্রামের মধ্যেই সাম্যবাদীর সমস্ত নীতিবোধ নিহিত আছে। আমরা কোনো চিরন্তন নৈতিকতায় বিশ্বাস করি না এবং আমরা নীতিবোধ সম্বন্ধে সমস্ত মিথ্যা গালগল্পের মুখোস খুলে দিই। মানব সমাজকে উন্নত স্তরে পৌঁছে দেওয়া, শ্রমকে শোষণমুক্ত করার জন্যই প্রয়োজন নৈতিকতার।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা যুব সমাজের সেই প্রজন্মকে চাই, যারা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বেপরোয়া লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে সুশিক্ষিত হতে শুরু করেছে। এই সংগ্রামে তারা প্রকৃত সাম্যবাদীদের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। এই প্রজন্মকে অবশ্যই এই সংগ্রামকে শিরোধার্য করতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপে নিজেদের অধ্যয়ন, শিক্ষা ও তালিমকে এই সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। মিষ্টি কথা আর কাল্পনিক নৈতিকতার বাণী দিয়ে সাম্যবাদী যুবকদের শিক্ষা হবে না। এগুলি কোনও শিক্ষাই নয়। যখন মানুষ দেখেছে কীভাবে তাদের বাবা-মায়েরা জমিদার ও পুঁজিপতিদের দাসত্বের শিকলে বাঁধা থাকতেন, শোষকদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই শুরু করেছিল তাদের যন্ত্রণা যখন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে দেখেছে, যা জয় করা হয়েছে তাকে রক্ষার জন্য কত আত্মত্যাগ করতে হয়েছে তা যখন তারা বুঝেছে এবং জমির মালিকরা আর পুঁজিপতিরা যে কত বড় সাংঘাতিক শত্রু হতে পারে তা যখন তারা দেখেছে–এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে তারা সাম্যবাদী হওয়ার শিক্ষা পেয়েছে। সাম্যবাদকে সংহত করা এবং তাকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়ার জন্য সংগ্রামই কমিউনিস্ট নৈতিকতার ভিত্তি। সাম্যবাদী অনুশীলন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরও ভিত্তি এটাই। এই হলো সাম্যবাদ কিভাবে শেখা উচিত সেই প্রশ্নের উত্তর।

আমরা সেই ধরণের শিক্ষা, অনুশীলন এবং বিদ্যায় বিশ্বাস করি না, যা বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং যা জীবনের উদ্দীপনা থেকে বিচ্যুত। যতদিন পর্যন্ত শ্রমিক-কৃষকরা জমিদার ও পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষিত হবে, যতদিন পর্যন্ত শিক্ষালয়গুলো জমিদারদের ও পুঁজিপতিদের অধীন থাকবে, ততদিন তরুণ সমাজ অন্ধ ও অজ্ঞ থাকবে। আমাদের বিদ্যালয়গুলোকে অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিমূলক বিষয়গুলি যুবকদের শেখাতে হবে, সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করার স্বকীয় ক্ষমতা তাদের মধ্যে তৈরি করতে হবে। বিদ্যালয়গুলিকে অবশ্যই যুবকদের শিক্ষিত মানুষ করে তুলতে হবে। স্কুলে শিক্ষালাভ করতে করতেই শোষকদের হাত থেকে মুক্তি অর্জনের সংগ্রামের অংশীদার হতে অবশ্যই শিখতে হবে তাদের। যুব কমিউনিস্ট লীগ একমাত্র তখনই সাম্যবাদী যুবকদের সংগঠন হিসাবে তার নামের সার্থকতা প্রমাণ করতে পারবে, যখন তার শিক্ষা-দীক্ষা ও অনুশীলনের প্রতিটি পদক্ষেপকে শোষকের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের সর্বজনীন সংগ্রামে অংশগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে। তোমরা সবাই জানো, যতদিন একমাত্র রাশিয়া শ্রমিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে থাকবে, আর বাকি বিশ্বে বুর্জোয়াদের পুরনো ব্যবস্থা টিকে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা ওদের থেকে দুর্বলতর হয়ে থাকবো, আমাদের সব সময়েই নতুন নতুন আক্রমণের হুমকির মধ্যে থাকতে হবে। দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেমন করে থাকতে হয় সেটা আমরা যদি শিখতে পারি, তবেই আমরা সামনের লড়াইগুলোতে জিততে পারবো এবং আরও শক্তি সঞ্চয় করে প্রকৃত অর্থে অজেয় হয়ে উঠতে পারব। তাই সাম্যবাদী হওয়ার অর্থ, তোমরা সমগ্র যুব সমাজকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করে তুলে এই লড়াইয়ে শিক্ষা ও শৃঙ্খলার উদাহরণ সৃষ্টি করবে। শুধু তখনই তোমরা সাম্যবাদী সমাজের কাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু করতে এবং তাকে সম্পূর্ণ করতে পারবে।

এই কথাটা পরিষ্কার বোঝার জন্য আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা নিজেদের সাম্যবাদী বলি। সাম্যবাদী কাকে বলে? কমিউনিস্ট একটি লাতিন শব্দ। লাতিন ভাষায় 'কমিউনিস' কথার অর্থ হল 'জনসাধারণ'। সাম্যবাদী সমাজ হলো সেই সমাজ, যেখানে সব কিছুই যেমন জমি, কারখানা প্রভৃতি সর্বসাধারণের সম্পত্তি এবং এখানে সকলে মিলে কাজ করে। এটাই হলো সাম্যবাদ।

সবাই যদি নিজের জমিতে আলাদাভাবে কাজ করে, তাহলে কি সকলের একসঙ্গে মিলে কাজ করা সম্ভব? সবাই যৌথভাবে কাজ করবে এমন ব্যবস্থা হঠাৎ প্রবর্তন করা যায় না। এটা অসম্ভব, এটা আকাশ থেকে পড়ে না। এটা আসে অনেক পরিশ্রম আর কষ্টের মধ্যে দিয়ে, এটা সংগ্রামের পথ বেয়ে সৃষ্টি হয়। পুরনো বই এখানে কোন কাজে লাগে না, কেউ এগুলিকে আর বিশ্বাসও করবে না। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতাই এখানে বড় প্রয়োজন। যখন কলচাক এবং দেনিকিন সাইবেরিয়া ও দক্ষিণ দিক থেকে এগোচ্ছিল, তখন কৃষকরা ছিল তাদের পক্ষে।

তারা বলশেভিকবাদ পছন্দ করত না, কেননা বলশেভিকরা তাদের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট দামে শস্য নিতো।

কিন্তু যখন সাইবেরিয়া এবং উক্রেইনের কৃষকরা কলচাক ও দেনিকিনের আস্বাদ পেল তখন তারা বুঝতে পারলো যে তাদের সামনে একটিই বিকল্প আছে– হয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে যেতে হবে, যারা তৎক্ষণাৎ তাদের জমির মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের দাসে পরিণত করবে অথবা শ্রমিকদের অনুসরণ করতে হবে। একথা সত্য যে, দেশে একেবারে দুধ আর মধুর বন্যা বয়ে যাবে- এমন প্রতিশ্রুতি শ্রমিকরা দেয়নি। বরং কঠোর লড়াইয়ের জন্য দৃঢ়তা ও লৌহকঠিন শৃঙ্খলা দাবি করেছে, যারা তাদের পুঁজিপতি আর জমিদারের দাসত্ব থেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করবে। অজ্ঞ কৃষকরাও নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একথা ভালো করে বুঝতে পারলো এবং কঠিন শিক্ষার মধ্য দিয়ে তারা সাম্যবাদের সচেতন অনুগামীতে পরিণত হলো। এই অভিজ্ঞতাই যুব কমিউনিস্ট লীগের সকল কাজের ভিত্তি তৈরি করবে।

কমরেড লেনিনের 'দি টাস্ক অব দি ইউথ লীগ' থেকে সংকলিত।

জলবায়ু সম্মেলন

পুঁজিপতিদের মুনাফা লিপ্সার শিকার প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ

১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর জাতিসংঘ ও উন্নত দেশগুলোর আহ্বানে একটি সম্মেলন হয়ে থাকে। সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ ও ২০১৫ সালে যথাক্রমে কিয়োটো ও প্যারিস নামে দুটি বৃহৎ জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তিতে স্বাক্ষর করে উন্নত দেশগুলো ওয়াদা করেছিল যে তারা কার্বন নিঃসরন কমাবে যাতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ পায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো এরপর থেকে কার্বন নিঃসরনের পরিমাণ বেড়েছে। এই সম্মেলন ও সম্মেলন থেকে গৃহীত পদক্ষেপগুলো মূলত ফাঁকা বুলি, লোক দেখানো কাজ কারবার। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণি এই বিপর্যয় সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতে পারে না ফলে তাদেরকে জনগণের সামনে আপাত সমাধান হিসেবে কিছু রাখতে হয়।

এই বছর নভেম্বরে সেই সম্মেলন হয়েছে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে। আইপিসিসি এর আগস্ট রিপোর্টে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিট নিঃসরণ বর্তমানের চেয়ে অর্ধেক এবং ২০৫০ সালে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিট নিঃসরণকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য সুপারিশ করা হয়। তাপমাত্রা এর থেকে বেশি বাড়লে অপরিবর্তনীয় বিপর্যয় ঘটবে। কিন্তু সম্মেলনে গৃহীত পদক্ষেপগুলো যদি উন্নতদেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তাহলে শতাব্দী শেষে তাপমাত্রা বাড়বে ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বিপর্যয় এড়ানো যাবে না। অতীত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সম্মেলনে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো কখনোই পূরণ করতে পারেনি দেশগুলো। বর্তমানে যে হারে কার্বন নিঃসরণ কমাচ্ছে দেশগুলো সেই হারে চলতে থাকলে শতাব্দী শেষে তাপমাত্রা বাড়বে ২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা মহাবিপর্যয় ডেকে আনবে। ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু অর্থায়ন হিসেবে ১০০ কোটি ডলার দেওয়ার কথা ছিল, তারা এখনো সম্পূর্ণ অর্থ দিতে পারেনি। এবার প্রায় সব দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে বন উজাড় সম্পূর্ণরূপে রোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি তারা আগেও দিয়েছিল, ২০১৪ সালে। ২০১৪ চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা, ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেক বন উজাড় করার এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এটি শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; তবে ২০১৪-২০২০ সময়ের মধ্যে বন উজাড় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্মেলনে প্রথম প্রথম ২০৩০ সালের মধ্যে সকল কয়লাভিত্তিক শক্তিকেন্দ্র বন্ধ করার চুক্তি করার কথা ছিল ৪০টি দেশের। কিন্তু পরবর্তীতে দেশগুলোর চাপে 'বন্ধ' করার পরিবর্তে 'হ্রাস' করার প্রস্তাব আনা হয়। জলবায়ু বিজ্ঞানী আহসান আহমেদের মতে "আমরা এখন যতই চেষ্টা করি না কেন, এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২.৫ থেকে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। আমরা এই সম্মেলনে আমাদের অঙ্গীকার থেকে

● ৬ এর পাতায় দেখুন

সাম্যবাদ

শেষ পৃষ্ঠা

৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারী-২০২২

আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন ও জনগণের অধিকার আদায়ে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে

৩০ ডিসেম্বর 'কালো দিবস' পালন

আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন ও জনগণের অধিকার আদায়ে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আওয়ামী সরকারের ভোট ডাকাতির নির্বাচনের তিন বছর পূর্তিতে 'কালো দিবস' পালন করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট। গত ৩০ ডিসেম্বর পল্টনে বাম জোটের উদ্যোগে বিক্ষোভ

● ২ এর পাতায় দেখুন

ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনা স্থগিতের দাবিতে সমাবেশ

ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা বন্ধে হাই কোর্টের নির্দেশনা স্তগিত কারা এবং সকল অটোরিক্সার নাম্বার প্লেইট প্রদান সহ ৭ দফা দাবিতে ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা শ্রমিক ফেডারেশন, হবিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে গত ২৮ ডিসেম্বর বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।সংগঠনের সভাপতি শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জব্বারের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা ধনু মিয়া,সহসভাপতি সামছুর রহমান,সঞ্জিব আলী প্রমুখ।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ডিজেলের মূল্য কমানোর দাবিতে সমাবেশ

কৃষি কাজে ব্যবহৃত ডিজেলের মূল্য কমানো, বয়স্ক-পঙ্গু - বিধবা ভাতা প্রদানে দূর্নীতি-অনিয়ম বন্ধ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ওএমএস-টিসিবির মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে নিত্যপণ্য সরবরাহ বাড়ানোর দাবিতে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় চর শৌলমারী ইউনিয়ন শাখা, প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে দুই শতাধিক কিষাণ কিষাণীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কৃষক সংগঠক রহমত আলীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা ফখরুদ্দিন কবির আতিক, মহিউদ্দিন মহির, আক্কাছ আলী ও খায়রুন্নেসা সরকার।

'জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২০' শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনবে

সম্প্রতি 'জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২০' এর নামে সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নীতিমালা প্রবর্তন করেছে যা কার্যকর হবে ২০২৩ সাল থেকে। সরকার প্রচার করছে এটি অত্যন্ত সময়য়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা এ শিক্ষাক্রম শিক্ষাব্যবস্থায় ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে। আমাদের এই আশঙ্কার দিকগুলি সকলের সামনে রাখছি।

জাতীয় শিক্ষাক্রমের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল গৃহিত হলো অথচ এতে নেই শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ছাত্র সংগঠনসহ অন্যান্যদের অংশগ্রহণ। ওয়েবসাইটে খসড়া বক্তব্য দিয়েই সরকার দায় সেরেছেন। ফলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সংগঠন সবাই প্রায় অন্ধকারেই থেকে যায়। এই কাজটি করা হয়েছে কতিপয় আমলা ও সরকারের বিশ্বস্ত বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে। ফলে এতে স্থান পায়নি মানুষের স্বার্থ, স্থান পেয়েছে সরকারের এজেন্ডা ও প্রয়োজন।

শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত শিখনকালীন মূল্যায়ণ যদি আনুষঙ্গিক আয়োজন ছাড়াই চালু করা হয় তবে শিক্ষায় ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন হবে ৭০ শতাংশে আর সামষ্টিক মূল্যায়ন (বার্ষিক পরীক্ষা) ৩০শতাংশ। একই ভাবে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণিতে যথাক্রমে ৬০ শতাংশ ও ৪০ শতাংশে এবং নবম-দশম শ্রেণিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন হবে যথাক্রমে ৫০ শতাংশে। শিখনকালীন মূল্যায়ন বা ধারাবাহিক মূল্যায়ণ নিঃসন্দেহে একটি উন্নত প্রক্রিয়া। কিন্তু স্থান,কাল বিবেচনায় না নিলে উন্নত প্রক্রিয়াও সব সময় উন্নত ফল দেয় না। দুধ অত্যন্ত উপাদেয় খাবার। কিন্তু তা জণ্ডিস রোগিকে খাওয়ালে ফল হয় মারাত্মক। একই ভাবে শিখনকালীন মূল্যায়ন উন্নত প্রক্রিয়া হলেও বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় তা কার্যকর হবে না। আবার প্রশিক্ষণের দিক থেকে বাংলাদেশের শিক্ষকরা দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে

● ৭ এর পাতায় দেখুন

পতেঙ্গা সি বিচ ইজারার আয়োজন

'উন্নয়নে'র বলি সাধারণ মানুষের বিনোদন

"হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, / হে চির-বিরহী , হে অতৃপ্ত! / রহি' রহি'/ কোন্ বেদনায়? / উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায় ?/ কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি ?/ প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে উর্ধ্বে নীলা নিম্নে বেলা-ভূমি! / কথা কও, হে দুরন্ত, বল , /তব বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এত কলকল ? /কিসের এ অশান্ত গর্জন? / দিবা নাই রাত্রি নাই, অনন্ত ক্রন্দন / থামিল না, বন্ধু, তব! / কোথা তব ব্যথা বাজে! মোরে কও, কা'রে নাহি ক'ব!" (সিন্ধু : প্রথম তরঙ্গ,কাজী নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম, ১৯২৬ সাল)

চট্টগ্রাম পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে বসে কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২৬ সালে এ কবিতাটি লিখেছিলেন। নজরুল তাঁর মনের অনুভূতি কবিতায় প্রকাশ করেছেন। গভীর বেদনার আলোড়ন বুকে নিয়ে সমুদ্রের গর্জন কাব্যরূপ পেয়েছে নজরুলের লেখনীতে। সমুদ্রদর্শনে কবির মনে যে ভাব সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষও সে ভাবের স্বাদ পায় কবিতা পড়ে। আর সাধারণ মানুষ সৌন্দর্যের আকর্ষণে সমুদ্রের বিশালতার কাছে বার বার ছুটে যায়। ক্লান্তিময় ব্যস্ততার অবসাদ ঘুচাতে পরিবার পরিজন বন্ধুসহ সৈকতে ছুটে আসে। আজ নজরুল বেঁচে থাকলে, যদি শুনতেন এ সাগরপাড় ইজারা দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদের হাতে, কি লিখতেন?

হ্যাঁ, নজরুলের স্মৃতি জড়ানো চট্টগ্রাম নগরবাসীর

● ৭ এর পাতায় দেখুন

বাকৃবিতে ছাত্র ফ্রন্টের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বাকৃবি শাখার ১৪ তম সম্মেলনের মাধ্যমে তানজিলা ইসলাম ঋতু কে সভাপতি ও রিফা সাজিদাকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক ও নিরাপদ ক্যাম্পাস, বাকৃবিতে পূর্নাঙ্গ রেলস্টেশন চালু, সপ্তাহে ৭ দিন লাইব্রেরি খোলাসহ ৯ দফা দাবিতে বুধবার সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বাকৃবি শাখার ১৪ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স-৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org; ই-মেইল : mail@spbm.org